করোনা অতিমারি এবং পুঁজিবাদ

১ম অংশ

পরিযায়ী শ্রমিক ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

আপডেট স্টাডি গ্রুপ, ০১.০৫.২০২০

জামলো মকদম পারেনি। বাকি ছিল আর ৫০ কিলোমিটার পথ। ১০০ কিলোমিটার পথ সে পুলিশের ভয়ে মূল রাস্তা এড়িয়ে জঙ্গুলে পথে পাড়ি দিয়েছিল হেঁটে – তেলেঙ্গানা থেকে ছত্তিশগড়ের বিজাপুরের নিকটবর্তী গ্রামের বাড়িতে ফেরার জন্য। কিন্তু 'মাত্র' ৫০ কিলোমিটার আগে ১২ বছরের বালিকার বা শিশু-শ্রমিকের জীবনদীপ নিভে গেল। যথারীতি ময়নাতদন্ত হল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হল তার মৃত্যু ঘটেছে ডিহাইড্রেশনের ফলে। তেলেঙ্গানার লঙ্কাখেতে শ্রমক্ষমতা ব্যয় করে রোজগারের পথ তার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

পারেনি রণবীর সিং-ও। দিল্লির রেস্তোঁরায় কাজের মাঝে ২৪ মার্চ গভীর রাতে হঠাৎ করে লকডাউন! মরিয়া রণবীর ২৮ মার্চ ৩২৫ কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রদেশের গ্রামে ফেরার জন্য হাঁটা শুরু করেছিল। ২০০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রমও করল। কিন্তু রাস্তাতেই হল তার মৃত্যু। ময়নাতদন্তে জানা গেল তার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বালা লোগেশ, ইনসাফ আলি, কিংবা এমন আরও অনেকের 'কপাল' বড় মন্দ। কেউ পাঁচশো, কেউ হাজার, এমনকি কেউ দেড় হাজার কিলোমিটার হেঁটে যাওয়ার মতো অসম্ভব পথ বেছে নিয়েছিল। কেউ জলের অভাবে, কেউ অসীম ক্লান্তিতে, কেউ স্রেফ উপযুক্ত খাবারের অভাবে, কেউ বা হাইরোডে নিতান্তই গাড়ির ধাক্কায় মরে গেল। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত সংখ্যাটা নাকি দুশো ছিল। এখন বোধহয় তাদের আর কেউ গুনছে না। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে মৃত মানুষের সংখ্যার ভীড়ে তারা আপাতত চাপা পড়েছে।

এদের মৃত্যু বোধহয় অনিবার্য ছিল। মাইলের পর মাইল হাঁটার সময়ে টিভির পর্দায় কিংবা সংবাদপত্রের পাতায় তাদের অনেক ছবি ছাপা হয়েছে। মাথায় জিনিসপত্রের বোঝা, কোলে ঘুমন্ত শিশু, ন্যুব্জ হতক্লান্ত দেহ – নারী-পুরুষ পরিযায়ী শ্রমিকরা হেঁটে চলেছে – যেন বা দেশভাগের স্মৃতির করুণতম দৃশ্যকল্পনা – এমন তাজা খবর দিন দশেক ধরে সংবাদমাধ্যমে জীবন্ত হয়েছিল। লকডাউন অমান্য করে, 'সামাজিক দূরত্ব' রক্ষা না করে দিল্লির বাসস্ট্যান্ডে, কিংবা মুম্বাইয়ের বান্দ্রায়, কিংবা সুরাটের রাজপথে ভীড় করার জন্য তারা টিভির পর্দায় যথেচ্ছ ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত। 'এইসব মানুষগুলির কি কোনও বোধ নেই'? 'তাদের সচেতন করা হচ্ছে না কেন'? 'পুলিশ-প্রশাসন কী করছে' এমন প্রশ্নে টিভির সুবেশ-সুবেশী সঞ্চালক-সঞ্চালিকাবৃন্দ সোচ্চার। তাদের সঙ্গে একশো ভাগ সহমত মেট্রো শহর থেকে শহরতলীর অগণিত দর্শক। কেউ বা শিহরিত হয়েছে। উচ্চবর্গের মানুষের অনুদান-পুষ্ট এবং সংসদীয় রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবকরা গাড়ি নিয়ে দৌড়ে গেছে জলের বোতল বা খাবারের প্যাকেট হাতে। টিভিতে ছবি উঠেছে। খুব শীঘ্রই উচ্চবর্গ নরনারী তা ভুলেও গেছে। কী করে করোনার কবল থেকে নিজেকে বাঁচানো যায় তার জন্য স্যানিটাইজারে বারবার হাত ধুয়েছে, মুখাবরণীতে নাকমুখ ঢেকেছে, গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়েছে। তবে সংবাদমাধ্যম সত্যি একটা কাজের কাজ করেছে। মিডিয়াতে এই মহামিছিলের ছবি দেখতে না পেলে তারা হয়তো জানতেও পারত না দেশে এমন 'হতভাগা' ক্ষুধার্ত শ্রমজীবী মানুষের দঙ্গল আছে যারা স্রেফ খিদের জ্বালায়, দুইবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় কিংবা বাঁচার 'জান্তব' চাহিদায় (করোনার ভয়ে নয়) মাইলের পর মাইল পরিক্রমায় নেমে পড়তে পারে।

সরকারি পরিভাষায় এই লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিচয় হল পরিযায়ী শ্রমিক। এরা তাদের অনুন্নত প্রদেশ থেকে তুলনায় উন্নত

প্রদেশে, পশ্চাৎপদ জেলা থেকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জেলায় কাজের খোঁজে পাড়ি দেন কোটিতে কোটিতে, লাখে লাখে। উচ্চবর্গীয় উন্নাসিকতা ও তাচ্ছিল্যের আবরণ সরিয়ে চোখ মেলে তাকালে তাদের দেখা যাবে রাজধানী দিল্লি শহরের বৃহত্তর এলাকায় (ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন), হরিয়ানার ঝাঁ চকচকে শিল্পাঞ্চলে (মানেসর-গুরগাঁও), মহারাষ্ট্রের কিংবা গুজরাটের অগুন্তি কারখানার পাশে অলিতে গলিতে বস্তিতে, চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে, ব্যাঙ্গালোরের হাই টেক অট্টালিকার পাদদেশের ঝুপড়িতে, কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের বস্তিগুলোয় পাটকলের কন্ট্রাক্ট-ক্যাজুয়াল-বদলি শ্রমিক হিসেবে, পাঞ্জাব-হরিয়ানার কৃষিখামারে খেতমজুর হিসেবে, রাস্তাঘাট, বহুতল, শপিং কমপ্লেক্স, পাঁচতারা হোটেল-হাসপাতাল নির্মাণের শ্রমিক হিসেবে – অথবা, বড়-ছোট শহরগুলিতে হকার বৃত্তিতে, রাস্তাধারের অসংখ্য খুদে খুদে দোকানে, রিক্সা-ভ্যান-অটো-ট্যাক্সি চালনায়, বাসের ড্রাইভার বা কন্ডাক্টরিতে, কুলি-মুটের কাজে, বাবুদের জামাপ্যান্ট ইস্তিরির কাজে, কলের বা ইলেকট্রিকের মিস্তিরির কাজে, ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজের লোক, সাফাই কর্মী, জঞ্জাল-কুড়ুনি সহ নানা জাতীয় 'নীচু' মানের কাজ, ইত্যাদি ইত্যাদিতে। এরা শহরের আলোকিত স্বচ্ছল বাবুবিবিদের পাশেই ছিল, তাদের ফাইফরমাশ খেটে নিজেদের মুখের খাবার জোটাত। তারা মারুতি-হিরো-হোন্ডা গাড়ি বানায়, তিরুপতি-চেন্নাই-দিল্লি-ব্যাঙ্গালোরের অসংখ্য গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ফ্যাশনদুরস্ত দেখনদারি পোশাক বানায়; নেলপালিশ-মাস্কারা-গয়না বানাতে লাগে যেসব খনিজ দ্রব্য তার খননকার্যে, ইঁটভাটায়, কয়লাখনিতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, আরও হরেক রকম কাজে তারা নিয়োজিত।

২০১১ সালের সেনসাস মতে দেশে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ। (ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম, ০১.১০.২০১৭) ২০২০ সালে আনুমানিক ১৫ কোটি। এরা বছরের পর বছর ধরে হয় দিনমজুরি করে, অথবা অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। কাজ পেলে ভাল, না হলে বসে থাকে – মাসে পনেরো-কুড়িদিনের বেশি কাজ জোটে না। সরকারি ভাষায় এদের অনেকেই ইনফর্মাল লেবার। কেউ কেউ নিয়মিত শ্রমিক এবং ফর্মাল। তবে দেশের ৬৪.৯ শতাংশ নিয়মিত শ্রমিকের, ৬৭.৮ শতাংশ কন্ট্রাক্ট শ্রমিকের এবং ৯৫.৩ শতাংশ ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকশ্রেণির কাগজে-কলমে কোনও চুক্তি নেই। (Report of the 5th Employment-Unemployment Survey 2015-16, Vol 1, Ministry of Labour and Employment, GoI) অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিকের নেই কাজের নিশ্চয়তা। নেই স্বাস্থ্য, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির মতো সুযোগ-সুবিধা। কর্মক্ষেত্রে ও কারখানায় কাজের এতই চাপ, কাজের পরিবেশ এতই জঘন্য যে তা চার্লস ডিকেন্সের আমলের ইংল্যান্ডকেও লজ্জা দেবে। আইন মোতাবেক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা। কিন্তু কন্ট্রাক্ট-ক্যাজুয়াল এমনকি বহু ক্ষেত্রে নিয়মিত শ্রমিকদেরও কাজের ঘণ্টা অর্ডারের সমতালে বাড়তে থাকে। বাধ্যতামূলক শ্রম। বহু ক্ষেত্রে ওভারটাইমের মজুরি মেলে না। পোশাক তৈরির কারখানায় টানা ৩৬ ঘণ্টা কাজ করার দৃষ্টান্তও আছে। এমনকি শ্রমিকদের টয়লেটে যাওয়ার সময়ও মেলে না। বহু স্থানে তারা জল কম খায় যাতে টয়লেট না পায়। কারখানায় হাত চালাতে হয় ঝড়ের বেগে, দুপুরের খাওয়ার সময়ও সীমিত। মেশিনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে আঙুল কাটা পড়ার ঘটনা আকছার। অবস্থাটা চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমা 'মডার্ন টাইমস'-এর মতো।

থাকার জায়গা বলতে কারখানার কাছে ঝুপড়ি-বস্তি-ঘেটো। এক-একটা ঘরে দশ-বারো জন গাদাগাদি করে থাকা। সকালে কাজের তাড়া থাকলেও গণ-টয়লেটে অন্তত কুড়িজনের পিছনে লাইন। সাবান মেখে আরামদায়ক স্নানের সুযোগ নেই। তারপর নাকে-মুখে কিছু গুঁজে কারখানার গহ্বরে আবার ঢুকে পড়া। সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে যৎসামান্য মজুরি। খাওয়া-খরচ, বস্তির ঘর ভাড়া, বিদ্যুতের ভাড়া, পরিবহণের খরচ, বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে তাদের হাতে আর কিছু থাকে কিনা সন্দেহ। শহরের শ্রমিকদের ৫৭ শতাংশের মাসে রোজগার দশ হাজার টাকার কম; ৬০ শতাংশ ক্যাজুয়াল শ্রমিকের রোজগার মাসে পাঁচ হাজারও নয়; ৮৪.৩ শতাংশ ক্যাজুয়াল লেবার মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকাও পায় না। (নিউজক্লিক, ১১.০৪.২০) অপুষ্টি ও অর্ধাহার এদের ও তাদের পরিবারের নিত্যসঙ্গী। সংক্রামক রোগের প্রথম বলি হয় এরাই। ভারতে বছরে ২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়, যাদের সিংহভাগ হল গরিব মেহনতী মানুষ। (ল্যানসেট, ১৯.০৩.১১) প্রতিদিন টিবি রোগে মারা যায় ১২০০ মানুষ। (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৬.০৪.২০) এছাড়া আছে আন্ত্রিক, টাইফয়েড, ডেঙ্গু, ইত্যাদি। মারি ও মৃত্যু তাদের একান্ত

জীবনসঙ্গী।

খুব সংক্ষেপে এরাই হল কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের একাংশ। এরা হল শ্রমিকশ্রেণি। সমাজের বাবুবিবি-ভদ্রলোক, পুঁজিপতি-সম্পত্তিবান-স্বচ্ছল মানুষের অ-নে-ক নীচে তাদের অবস্থান। প্রায় 'মনুষ্যেতর' প্রাণির মতো এরা শহর-শহরতলীর আনাচে-কানাচে কোনও ক্রমে বেঁচেবর্তে আছে। ক্লেদাক্ত, নোংরা, দুর্গন্ধময় পরিবেশে তাদের নিবাস। অথবা, বলা ভাল, তাদের এভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে পুঁজিপতিদের স্বার্থে। কেননা, এদেরই শ্রমক্ষমতা নিংড়ে অট্টালিকা-ইমারত নির্মাণ, বাড়ি-গাড়ি, বিলাস-ব্যসনের ছড়াছড়ি। এদের শ্রমক্ষমতার জন্য এতটাই কম মজুরি নির্ধারিত হয়েছে যাতে তারা কোনও ক্রমে নিজেদের অতি প্রয়োজনীয় বা কোনও ক্রমে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য খাবার-দাবার, মাথা গোঁজার মতো একটা কুঠুরি, লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাক, চিকিৎসার খরচ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বাবদ খরচ রোজগার করতে পারে। যত কম মজুরি, যত কম ব্যবস্থাপত্র, পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা ও সম্পত্তি ততটাই বেশি। পুঁজিপতিদের শ্রেণি-অনুগামী এবং শ্রেণি-দোসর অন্যান্য বড়লোক-বিত্তশালী-সম্ভ্রান্ত-অভিজাত সম্প্রদায়ের যাবতীয় মহিমা-গরিমা এদেরই ঘামরক্তে নির্মিত। কেন্দ্র-রাজ্য সরকারে যেসব কর্তাকর্ত্রীরা শাসন চালায় তারা এই উচ্চবর্গীয় শ্রেণিস্বার্থেই নিবেদিতপ্রাণ।

তাই ২৪ মার্চ মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে লকডাউন ঘোষণার সময় নীচুতলার এই কোটি কোটি শ্রমজীবীর কথা ভাবা হয়নি। অতিশ্রম, অপুষ্টি, অর্ধাহার, মারি ও মৃত্যু যাদের নিত্যসঙ্গী তাদের কথা কেনই বা ভাবা হবে? লকডাউনের সময় দিনমজুররা থাকবে কোথায়, খাবে কী, বাড়ি ফিরতে চাইলে ফিরবে কীভাবে তা ভাবার অবকাশ বা ইচ্ছা শাসকবর্গের শ্রেণিস্বার্থ অনুমোদন করে না। তাই মরিয়া মানুষগুলির রাস্তায় মারা পড়াকে ডাক্তারি পরিভাষায় ডিহাইড্রেশনে বা হৃদরোগে মৃত্যু বলা হবে না কি বলা হবে রাষ্ট্রীয় হত্যা, সেটাই বড় প্রশ্ন।

অথচ, করোনা ভাইরাস যে তার মরণকামড় বসাতে চলেছে তার পূর্ণ ইঙ্গিত ছিল। ভারতে প্রথম করোনা কেস হয় ৩০ জানুয়ারি। ততদিনে করোনা চীনে মহামারি। ইউরোপে তার ভ্রূকুটি দৃশ্যমান। কিন্তু দেশের শাসকবর্গ তখন গভীরতর কাজে ব্যস্ত। কীভাবে দিল্লি নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিষের বিস্তার ঘটানো যায়, কীভাবে নির্বাচনে পরাজয়ের পর দাঙ্গা লাগানো যায়, কীভাবে মার্কিন অধিপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সাদর অভ্যর্থনা করে ৩০০ কোটি ডলারের মারণাস্ত্র কেনার চুক্তি করা যায়, (ইন্ডিয়া টুডে, ২৫.০২.২০) কীভাবে শাহিনবাগের অবাধ্য দুর্বিনীত প্রতিবাদীদের ঠান্ডা করা যায় এবং কীভাবে মধ্যপ্রদেশে ঘোড়া কেনাবেচা করে নির্বাচিত সরকারকে উল্টে দেওয়া যায়, ইত্যাদি 'অতি জরুরি' কাজ তখন তাদের হাতে ছিল। করোনা ভাইরাস হানা দিলে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের কী অবস্থা হবে, বিদ্যমান অকর্মণ্য স্বাস্থ্যব্যবস্থায় গরিব-গুর্বোর চিকিৎসা কীভাবে হবে তা নিয়ে শাসককুল আদৌ ভাবিত ছিল না। এমনকি হু পর্যন্ত জানিয়েছে তারা জানুয়ারির শেষভাগে অ্যালার্ম বেল বাজালেও তাতে অনেকেই কর্ণপাত করেনি। (কাউন্টারকারেন্টস, ২৮.০৪.২০) মার্চের ১৩ তারিখে হু অতিমারি ঘোষণা করলেও শাসকবর্গ তখন মধ্যপ্রদেশ তাস খেলায় মত্ত। এমনকি বিদেশাগত মূলত সম্পত্তিবান শ্রেণির সন্তানদের কোয়ারান্টিনে পাঠানোর ক্ষেত্রেও তারা চোখ বুজে ছিল। লকডাউন ঘোষণার আগে জরুরি ট্রেনের বন্দোবস্ত করে পরিযায়ী শ্রমিকদের দ্রুত ঘরে পাঠানো, জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ গরিবের থেকেও গরিব জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য-চিকিৎসার আগাম ব্যবস্থা করা, লকডাউন হলে মালিকশ্রেণিকে শ্রমিক-কর্মচারীর বরাদ্দ বেতন/মজুরি দিতে বাধ্য করা, করোনা মোকাবিলায় হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো, যথোপযুক্ত টেস্ট-কিট, মাস্ক, পিপিই, স্যানিটাইজারের জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ, ইত্যাদি ছিল তখনকার অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। অথচ, 'ভগবান নিদ্রা না গেলেও' ব্যস্ত ছিলেন অন্যান্য কাজে। ফলে চার ঘণ্টার 'প্রস্তুতিতে' লকডাউন জারি হলে একমাত্র বড়লোক, সম্পত্তিবান শ্রেণিই যে তাদের গচ্ছিত সম্পদ, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারি, ইত্যাদিতে সবচেয়ে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজের নীচুতলার গরিব শ্রমজীবী মানুষ। শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের এটাই নিয়ম। কাঁচা ঘর ভাঙে গরিব মানুষের। ফসল নষ্ট হয় তাদের। দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয় তারাই। সবার আগে তারাই মারা যায়। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এতটাই অপ্রতুল এবং

স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ে যেভাবে বেসরকারি পুঁজির রমরমা, তার ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবচেয়ে বিপদে পড়ে দেশের নীচুতলার অধিকাংশ মানুষ। ২০১৭-১৮ সালে গ্রামীণ ভারতের ৮৫ শতাংশ এবং শহুরে ভারতের ৮১ শতাংশ মানুষের কোনও স্বাস্থ্যবিমা ছিল না। (লাইভমিন্ট, ৩০.০৩.২০) গ্রামীণ ভারতে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩০ শতাংশ কম আছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ৬০ শতাংশ চলে মাত্র ১ জন ডাক্তারে। ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ডাক্তার-ই নেই। (লাইভমিন্ট, ০৩.০৪.২০) সরকারি হাসপাতাল-শয্যার সংখ্যাও তথৈবচ। প্রতি ১০০০ জনে শয্যাসংখ্যা মাত্র ০.৭। অথচ জাপানে তা ১৩.৪, দক্ষিণ কোরিয়াতে ১০.৩, জার্মানিতে ৮.২, চীনে ৩.৮, এমনকি ইরানেও ১.৭। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৫.০৩.২০) সারা ভারতে যত হাসপাতাল বেড আছে তার মাত্র ৫-৮ শতাংশ আইসিইউ। (ইন্ডিয়ান কালচারাল ফোরাম, ২৭.০৩.২০) ভারতে প্রতি হাজার জনে ডাক্তার আছে ০.৮ জন; জার্মানিতে ৪.২, ইতালি ও স্পেনে ৪.১, ফ্রান্সে ৩.২, আমেরিকাতে ২.৬, চীনে ১.৮, ইরানে ১.১। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৫.০৩.২০) ২০১৮ সালে ভারতে জনস্বাস্থ্যে মাথাপিছু বাৎসরিক খরচ ছিল ১১১২ টাকা, অর্থাৎ দিনে মাত্র ৩ টাকা ৪ পয়সা। (ফার্স্টপোস্ট, ২১.০৬.১৮) সরকারের কী নির্মম রসিকতা! করোনা কেন, টিবি থেকে শুরু করে ক্যানসার, হৃদযন্ত্রের গোলযোগ, কিডনি বিকল হওয়া, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গু, ইত্যাদি নানা রোগে গরিব শ্রমজীবী মানুষের কাছে সুচিকিৎসা অনেক দূরের বস্তু। সুতরাং অতিমারির ফলে কারা সবার আগে বিপন্ন হবে, কারা কীটাণুকীটের মতো হয় মারা যাবে, অথবা সর্বস্বান্ত হবে তা তো অত্যন্ত স্পষ্ট।

ঘরমুখো পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি পুঁজিপতি-সম্পত্তিবান শ্রেণিস্বার্থে পরিচালিত সরকারগুলোর ভূমিকাও মর্মান্তিক। পুলিশের ডান্ডা-মারধোর তো আছেই। উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর জীবাণুনাশক রাসায়নিক স্প্রে করার দৃশ্যও দেখা গেছে। যেন তারা গরু-ভেড়া-ছাগলের মতো মনুষ্যেতর জীব! আগ্রাতে দেখা গেছে কোয়ারান্টিনে থাকা শ্রমিকদের প্রতি দূর থেকে খাবার-জল ছুঁড়ে দেওয়ার দৃশ্য। ২৭ মার্চ থেকে করা এক সমীক্ষাতে 'স্ট্র্যান্ডেড ওয়ার্কার্স অ্যাকশন নেটওয়ার্ক' জানিয়েছে বিভিন্ন শিবিরে বা স্থানে আটকে পড়া ৫০ শতাংশ শ্রমিকের কাছে মাত্র ১ দিনের রেশন অবশিষ্ট আছে। ৯৬ শতাংশ জানিয়েছে তারা সরকার থেকে কোনও রেশন পায়নি। ৭৪ শতাংশ বলেছে একুশ দিনের লকডাউনে চালানোর মতো প্রাপ্ত মজুরির অর্ধেক অবশিষ্ট আছে। ৮৯ শতাংশ জানিয়েছে তাদের নিয়োগকর্তারা লকডাউন সময়ের জন্য কোনও মজুরি দেয়নি। (কাউন্টারকারেন্টস, ১৫.০৪.২০) সুপ্রিম কোর্টও আটকে থাকা শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে খাবার যখন দেওয়া হচ্ছে, হাতে টাকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন! জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলির প্রায় কোথাও বেতন হয়নি। পুঁজিপতিদের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র জানিয়েছে ৭০-৮০ শতাংশ শিল্পে ১০ থেকে ১২ কোটি শ্রমিকের মজুরি দেওয়া হয়নি। (ইকনমিক টাইমস, ২৮.০৪.২০) স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার দেড় বছরের জন্য ডিএ ফ্রিজ করে দিয়েছে। কেরালা সরকার আগামী পাঁচ মাসে কর্মচারীদের ছয় দিনের বেতন কেটে নেবে জানিয়েছে। (দ্য হিন্দু, ২২.০৪.২০) খোদ শ্রমবিষয়ক সংসদীয় কমিটি সম্প্রতি জানিয়ে দিয়েছে মালিকপক্ষ লকডাউন পর্যায়ে কর্মীদের বেতন দিতে বাধ্য নয়। (দ্য হিন্দু, ২৩.০৪.২০) নামকরা প্রতিষ্ঠান সিএমআই তথ্য-পরিসংখ্যান হাজির করে জানিয়েছে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত দেশে ১৪ কোটি শ্রমিকের কাজ চলে গেছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪.০৪.২০) ইতিমধ্যে গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থানে একই মজুরির হারে (অর্থাৎ ওভারটাইমের ডবল রেট নয়) ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের পরিবর্তে ১২ ঘণ্টার কাজের দিন চালু করার ব্লুপ্রিন্ট রচিত হয়ে গেছে। (দ্য ওয়্যার, ২৭.০৪.২০) বলা বাহুল্য, মালিকশ্রেণি অনেকদিন ধরেই যা চাইছিল লকডাউনের সুবিধা নিয়ে তাকেই কার্যকর করা হচ্ছে। সুতরাং করোনার মতো অতিমারি যে প্রকৃতপক্ষে গরিব শ্রমজীবী মানুষের উপর হিংস্র হানাদারি চালাবার এক জবরদস্ত হাতিয়ার তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কেন্দ্রীয় সরকার গরিব শ্রমজীবী মানুষের জন্যে ১.৭০ লাখ কোটি টাকার দান-খয়রাতির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তা আদৌ যথেষ্ট কি না, তা পুরনো প্রকল্পগুলোকে নতুন নামে চালানো হচ্ছে কি না সেই সব অভিযোগ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি হচ্ছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (যেমন তিন মাস ধরে গরিবের হাতে ৫০০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এর অর্থ হল প্রতি পরিবার পিছু দিনে ১৬.৬৬ টাকা; অথবা মাথাপিছু দিনে ৪ টাকারও কম। (দ্য ওয়্যার, ০২.০৪.২০) এই হল

সরকারি বদান্যতা!) আসলে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা, মোড়ল-দাদা-নেতার মুরুব্বিয়ানার গণ্ডি পেরিয়ে ত্রাণ বা খয়রাতি গরিবের হাতে যে প্রকৃত অর্থে পৌঁছাবে না তা যে কেউ চোখ বুজে বলে দেবে। বাস্তবত দেখা যাচ্ছে বহু স্থানে রেশন ও খাদ্য বণ্টনের দাবিতে ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষোভের প্রকাশ। সরকারি ভাঁড়ারে যে চালগম মজুত আছে তা ন্যূনতম পরিমাণের তিনগুণের বেশি। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২১.০৪.২০) অথচ গরিব শ্রমজীবীর কাছে তার পৌঁছানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। অবশ্য ব্যবস্থা কোনও কালেই ছিল না। ২০১৭ সালে সরকারি সমীক্ষা (ন্যাশনাল হেল্থ সার্ভে) জানায় যে, দেশের ১৯ কোটির বেশি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। প্রতিদিন ন্যূনতম পক্ষে ৭০০০ জন খিদের জ্বালায় প্রাণ হারায়, প্রতি বছরে ২৫ লাখ। আরও জানা যায়, ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে প্রতি বছর ৩ লাখ শিশু মারা যায়, প্রতিদিন ৪৫০০। (কাউন্টারভিউ, ২৪.০৪.২০) যারা অপুষ্টিতে ভোগে তারা সবচেয়ে দ্রুত সংক্রামিত হয় এ কথা কে না জানে! ফলে করোনার গ্রাসে পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কাদের তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাৎপর্যপূর্ণ হল, বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মতে এই দেশে প্রতি বছরে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ৪০ শতাংশ খাদ্য নষ্ট হয় বা পচে যায়। (পূর্বোক্ত) দেশের প্রায় অর্ধেক গরিব শ্রমজীবী মানুষের এই অবস্থা! সুতরাং পরিযায়ী শ্রমিকদের আশ্রয় শিবিরগুলির অবস্থা কতটা শোচনীয় তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। হরিয়ানা সরকার তো পরিযায়ী শ্রমিকদের আশ্রয়স্থল হিসেবে একটা আস্ত জেলখানা বানাতে চলেছে! (জাস্টিসনিউজ, ১০.০৪.২০) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটি ছোট্ট খবর থেকে জানা যাচ্ছে--

> ''(ঘরে) পাখা চলছে না, বিকল্প বিদ্যুতের কোনও ব্যবস্থা নেই; টয়লেটগুলি জীবাণুমুক্ত করা হয় না বললেই চলে; বেশির ভাগ পরিযায়ী শ্রমিক চলে যেতে চায় কেননা তাদের পরিবার বাঁচবে না; নিরাপত্তারক্ষীরা রূঢ় ব্যবহার করে; খাবার অত্যন্ত নিম্নমানের; হাত ধোয়া ও স্যানিটাইজারের কোনও ব্যবস্থা নেই; টয়লেটে দুর্গন্ধ; টয়লেটে জল সরবরাহ থাকে মোটে সকাল ৭টা থেকে ১১টা; স্নানের জন্য একটা মাত্র সাবান ও কাপড় কাচার কোনও সাবান নেই; মশার প্রাদুর্ভাব।'' (২৮.০৪.২০)

অবশ্য 'মনুষ্যেতর' জীবদের জন্য এর থেকে আর বেশি কি বরাদ্দ থাকবে? এমনকি লকডাউন ঘোষণার এক মাস পরেও সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর বিশেষ কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ, তীর্থযাত্রায় গিয়ে আটকে থাকা লোকজনকে ফিরিয়ে আনার জন্য বাতানুকূল বাসের বন্দোবস্ত হয়েছে। রাজস্থানের কোটায় উচ্চশিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণরত সম্পত্তিবান ঘরের সন্তানদের প্রত্যাবর্তনের জন্য সরকার এখন তৎপর। কে কোন শ্রেণির, তা দেখতে হবে তো!

কিন্তু করোনার মতো অতিমারি ভারতে ছড়াল কীভাবে? চীনের উহান প্রদেশে তার উৎপত্তি। কীভাবে তার উদ্ভব ঘটল তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা যা আমরা এই রচনার তৃতীয় অংশে করব। কিন্তু তা বিশ্বব্যাপী এবং বিশেষত ভারতে ছড়াল কীভাবে তা অবশ্যই এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। অতীতে উপনিবেশকারীরা, তাদের সৈনিকরা, বণিকরা, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিযায়ী মানুষ প্লেগ, স্মল পক্স, পীতজ্বর, কলেরা, সোয়াইন ফ্লু, সিফিলিস বহন করে নিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ব্যবসায়ী, সম্পত্তিবান, আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী, বিদেশে চাকুরিরত ও শিক্ষারত পরিযায়ীরা নিরন্তর আসা-যাওয়া করে এবং ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া-জীবাণু পরিবহণ করে। অর্থাৎ, বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদের অমোঘ অবদান হল মহামারি ও অতিমারি। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কেন্দ্রের ক্যাবিনেট সচিব জানিয়েছেন, ১৮ জানুয়ারি থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক বিদেশ থেকে বিমানে করে এদেশে এসেছে। (ইকনমিক টাইমস, ২৭.০৩.২০) এই বিপুল জনতা – যার মধ্যে বিদেশী পর্যটকরাও আছে – তারা অবাধে ঘুরেছে, ট্যাক্সি চেপেছে, রেস্তোঁরায় খেয়েছে, শপিং মলে কেনাকাটা করেছে, মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখেছে – ফলে এখানকার মানুষ, বিশেষত যারা পরিষেবা কর্মী, তারা খুব সহজেই সংক্রামক ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছে। আশ্চর্যজনক নয় যে, সরকার বাহাদুর যে তৎপরতার সঙ্গে 'নোংরা' পরিযায়ী শ্রমিকদের গায়ে জীবাণুনাশক রাসায়নিক স্প্রে করে তাদের 'পরিশুদ্ধ' করতে চেয়েছে (যেন বা গরিব, শ্রমজীবীরাই যাবতীয় রোগের ধারক-বাহক), সেই তৎপরতার ভগ্নাংশও তারা বিদেশাগত সম্পত্তিবান বা তাদের ঘরের সন্তানদের জন্য দেখায়নি। শুধু তাই নয়, নেতা-মন্ত্রীরা পুঁজিবাদী সমাজের কুকীর্তি আড়াল করে অতিমারির দায় চাপাচ্ছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ঘাড়ে। কিংবা ট্রাম্পের মতো চীনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ঢাকতে চাইছে।

তবে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব দ্বিতীয় অংশে।

মোদ্দা কথাটা হল, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর নেতা-মন্ত্রীরা তাদের নানা কার্যকলাপে যেভাবে পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থ বহন করে চলে, করোনা অতিমারির সময়ও তারা সেই শ্রেণিস্বার্থকেই অনুসরণ করছে। ফলে পরিযায়ী শ্রমিক সহ সমগ্র গরিব শ্রমজীবী মানুষের উপর করোনা ভাইরাসের আক্রমণ প্রকারান্তরে হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণির হামলা। অবশ্য, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এর থেকে ভিন্নতর কিছু হওয়া সম্ভব নয়।